এ কোন ভুবনের পারে

যুথিকা বড়ুয়া

ভাবতেই অবাক লাগে, এক'শ বছর আগেও পৃথিবীর রূপ-রং-রস ষোড়শী উর্বশীর মতো এমন রহস্যাবৃত ছিল না। যার বেশীর ভাগই ছিল সাগর-সমুদ্র, পাহাড়-পবর্বত, নদ-নদী আর জলাশয়। আর কোথাও ধূসর মরুভূমি। জনসংখ্যাও ছিল এখনকার অর্ধেক! যার অধিকাংশ মানুষই অত্যন্ত সহজ সরল এবং সাধারণভাবে জীবনযাপন করতো! যাদের আচার-আচরণ, পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গী, ভাষা ব্যবহার, সভ্যতা, লৌকিকতা ও মানবিকচেতনা তুলনায়মূলকভাবে সবই ছিল জমিন আসমান ফারাক! বিশেষতঃ তৎকালিন সাধারণ মানুষেরা দায়বদ্ধতায় হোক আর রুচিগত সৌজন্যেই হোক, প্রকৃতপক্ষে তারা সর্বাবস্থায় ছিলেন সংযমী এবং ঘরে-বাইরে সর্বত্রই সংযত হয়ে চলতেন। গুরুজনদেরও ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং গণ্যমান্য করতেন! যার ফলসরূপ স্বতঃস্ফূর্ত তরুণ -তরুণীদের আবেগ-অনুভূতির বাহ্যিক প্রকাশগুলি কখনোই বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গদের দৃষ্টিগোচর হতো না! এমন কী প্রণয়সংক্রান্ত ব্যাপারে কেউ জড়িয়ে পড়লেও কাক-পক্ষীতেও কখনো টের পেতো না! শুধুমাত্র বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে স্থাপিত হতো দু'টি সবুজ ও দৃঢ় মনের মধুর প্রেম এবং ভালোবাসা! যা সামাজিক ও পারিবারিক রীতি-নীতি অনুসারে পবিত্র বিবাহবন্ধন সূত্রে আবদ্ধ হয়ে আমরণ অটুট হয়ে থাকতো এবং একটি সুখের নীড় গড়ে তুলতো। কিন্তু কোনপ্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেলে, মান-সম্মানের টানাপোড়োনে সভ্যসমাজে অভিভাবকদের অবস্থান করাও ছিল একটা দূরূহ ব্যাপার! যে কারণে মেয়েদের স্কুল-কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করা, তরুণ যুবকদের সঙ্গে মেলামেশা করা কিংবা ঘু ঘু ডাকা নির্জন দূপুরে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে ওদের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা দেওয়া, এ সবই ছিল নিষিদ্ধ! আর বের হলেও একহাত ঘোমটা দিতে হতো! এক কথায় তৎকালীন স্নিগ্ধ সতেজ লাবণ্যময়ী যুবতী মেয়েদের সামাজিক ও পারিবারিক রীতি-নীতি অনুসারে মা-বাবার কঠোর শাসনের সীমাবদ্ধতায় খাঁচার বন্দি পাখীর মতো চার দেওয়ালের ভিতর আবদ্ধ হয়ে থাকতে হতো! নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা মতা প্রকাশ করবার স্বাধীনতাটুকুও তখন ছিলনা! অথচ প্রয়োজনবোধে অনুপযুক্ত বয়সেই মা-বাবা তাদের রুচিসম্মত পাত্রস্থ করে মেয়েদের সংসার ধর্ম পালনের দায়িত্ব সঁপে দিয়ে চিন্তা মুক্ত হতেন। শুধু কি তাই! বিয়ের পরও স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি একসঙ্গে হাঁটা চলার রেওয়াজ তখন ছিলনা! আমার দাদু-দিদাকে তো স্বচোক্ষে দেখেছি, বারান্দার একমাথায় আরাম কেদারায় অর্থশায়িত দাদু প্রসন্ন মেজাজে হোক্কা টেনে ধূঁয়ো ছাড়তেন! আর লজ্জাবতী কনের মতো একহাত ঘোমটা টেনে দিদা চুপটি করে বসে থাকতেন। দাদুর মুখও দর্শণ করতেন না! কথা বলতেন ঘোমটার আড়াল থেকে, অত্যন্ত ক্ষীণ শব্দে! তাই বলে তাদের কোমল হৃদয়ে প্রেম-ভালোবাসা, আবেগ-অনুভূতি কি ছিল না! অবশ্যই ছিল! কিন্তু এ যুগের ভোগবিলাসী নিলর্জ্জ বেহায়া ছেলেমেয়েদের মতো পথে-ঘাটে

জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নয়! তাদের তীব্র উপহাসে এবং অট্টহাস্যে পবিত্র ভালোবাসাকে কলঙ্কিত করে নয়! ছিল চার-দেওয়ালের ভিতরে, গভীর নীশিথে! একান্ত নিভৃতে! এক আবেগাপ্লুত মুহূর্তে!
আর এখন, শুধু জীবনধারাই নয়, সারাবিশ্ব জুড়েই মেশিনারী টেক্‌নলজী, বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং প্রাকৃতিক রূপ-বৈচিত্র্য থেকে শুরু করে, প্রেম-ভালোবাসা নিবেদনের ষ্টাইলও বদলে গেছে! তাও দিনে-দূপুরে! একেবারে লোকালয়ে! উন্মুক্ত নীলাকাশের নীচে! যা আমাদের চোখে অত্যন্ত দৃষ্টিকটূ! কিন্তু কেন? ভালোবাসা কি এতই মামুলি বস্তু? এর কোনো মূল্যই নেই! ভালোবাসা আসেই বা কোথা থেকে! কারণ ছাড়া কিছুই ঘটে না সংসারে! যেমন বসন্ত না এলে বাগিচায় ফুল ফোটে না। মনে আনন্দ-উচ্ছাস না থাকলে, আবেগ-অনুভূতিও জাগ্রত হয়না! তেমনি গভীর সুখানুভূতিতে মন-প্রাণ শিহরণে দোলা না দিলে ভালোবাসা কখনোই জন্ম নিতে পারেনা! যা অন্ন-বস্ত্রের মতো আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও একান্তভাবে প্রয়োজন! যার নাম করণে শরীর ও মনকে প্রভাবিত করে! পবিত্র করে। পরিশুদ্ধ করে। অচীরেই বয়ে আনে আনন্দ। সংসারে সমৃদ্ধি হয় সুখ আর শান্তি! নতুবা ভালোবাসা ব্যতীত মনুষ্য জীবন কখনো পরিপূর্ণ হয় না! বেঁচে থাকাটাই তখন কঠিন হয়ে দাঁড়ায়! এ কথা কে না জানে! কিন্তু তাই বলে কাঙালের মতো, আদিক্ষেতার মতো একেবারে প্রকাশ্যে!

সেদিন ছিল রবিবার, ছুটির দিন। দাঁড়িয়ে ছিলাম বাসষ্টপিজে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দূপুর বেলাতেই নেমে এসেছিল ঘোর অন্ধকার! একেই উইকেন্ড! বাস একটা মিস্ করলেই ব্যস্, থাকো দাঁড়িয়ে তীর্থের কাকের মতো!
ইতিমধ্যেই শুরু হয় গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি! প্রায় ভিজতে ভিজতে একযুগল বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এসে দাঁড়ালেন বাস ষ্টপিজে! তাদের চেহারা আর বেশভূষায় তামিলই মনে হচ্ছিল! হঠাৎ চোখে চোখ পড়তেই মুচকি হাসলেন দুজনে। ইতিমধ্যে একটি শ্বেতাঙ্গ যুবতী মেয়ে দ্রুত এসে দাঁড়ায়। লক্ষ্য করলাম, চোখে মুখের বিচিত্র ইশারায় কাকে যেন কি বলছে মেয়েটি! তবে যাই বলুক, শূন্যের মাঝে হস্তাঙ্গুলির নৃত্যকলাটি যে প্রেমের সংকেত ছিল, তা আর বোঝার অপেক্ষা রাখেনা! কিন্তু ওর ঐ কার্যকলাপে বৃদ্ধামহিলার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর আমাকে ভীষণভাবে চমকৃত করলো! একেবারে সাদা বাংলায়, ঢাকাইয়া ভাষায় গড়গড় করে বলে যাচ্ছেন। আমি স্ববিস্ময়ে পলকহীন নেত্রে উন্মুক্ত চিত্তে চেয়ে থাকি। শুনি কান পেতে। -'ছ্যামরিডা বোবা নাকি! হাত নাড়াইয়া ইগুলা কয় কি! আর কইতাছে কারে! কাউরেই তো দেখিনা!' বলে তার সন্ধানি চোখদু'টি চারদিকে বুলাতে লাগলেন। হঠাৎ বৃদ্ধলোকটি বলে উঠলেন, -'হ্যাগোর ভাষা আমরা বুঝুম না গিন্নী! হ্যাড়া হইল গিয়া এই যুগের পোলাপাইন! আমাগো দশবার কিনন্যা দশবার ব্যাচতে পারব! চলো চলো শীগ্‌গীর চলো, বাস আইস্যা পড়ছে!'

গলা টেনে দেখলাম, বাসটার হেড্ লাইটে লেখা, 'নট্ ইন্ সার্ভিস।' বাসটা মুহূর্তেই তীব্র বেগে নাকের ডগা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। আর তক্ষুণি শ্বেতাঙ্গ মেয়েটি দৌড়ে গিয়ে রাস্তার বিপরীত দিকের বাসষ্টপিজে দন্ডায়মান এশটি পেশীবহুল যুবকের প্রশস্ত বক্ষপৃষ্ঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্রমান্বয়ে ওর চঞ্চল ওষ্ঠাঘাতে যুবকটিকে ব্যাকুল করে তুললো! কে দেখল, কি মন্তব্য করল, তাতে কিছুই এসে গেল না ওদের! এসে গেল বৃদ্ধামহিলার! তিনি উন্মুক্ত নীল সামিয়ানার নীচে যুগলবন্দি নবীন প্রেমিক-প্রেমিকার অশোভনীয় ক্রিয়াকলাপে ক্রোধে অপদস্থ হয়ে বিব্রোত কণ্ঠে গর্জে উঠলেন, -'দ্যাখ্ছ, ছ্যামরিড়া কেমন বেয়াদপ, ব্যায়ক্কল! মানুষজন দ্যাখেনা! লজ্জা শরমও কি নাই ইগুলার! মা-বাপও কেমন! মাইয়ারে একলা ছাইরা দিছে! হ্যাগোর খবর রাখে কিছু! পোলাপাইন আমাগো নাই! এক কালে আমরাও তো পোলাপাইন আছিলাম! মা গো মা! চিন্তাই কড়ন যায় না!'
হঠাৎ বৃদ্ধলোকটি ধমক দিয়ে উঠলেন, -'তুমি হেই দিকে দ্যাখো ক্যান! তোমারে কইছি না, হ্যাড়া এই যুগের পোলাপাইন! ঐসব তুমি বুঝবা না! হ্যাগোর মহব্বতের হেইডাই ষ্টাইল! হ্যাড়া বিয়া সাধির ধার ধারে না! হ্যাড়া ইগুলারেই কয় প্রেম, ভালোবাসা, মহব্বত!'
বৃদ্ধা আঁতকে উঠলেন শুনে। বললেন, -'খাইছে, কও কি! আমরা কুন্ জগতে আইসা পড়ছি লো!'

সমাপ্ত

যুথিকা বড়ুয়া: কানাডা প্রবাসী লেখক ও সঙ্গীত শিল্পী ।